শাস্তি প্রদান : শরয়ি দৃষ্টিকোণ

[বাংলা]

আমর ইব্রাহীম

অনুবাদ : ইকবাল হোছাইন মাছুম

1431 – 2010

islamhouse.com

العقاب الفعال أسلوبًا تربويًا من منظور شرعي

[اللغة البنغالية]

عمرو إبراهيم

ترجمة : إقبال حسين معصوم

1431 - 2010

islamhouse.com

শাস্তি প্রদান : শরয়ি দৃষ্টিকোণ

প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ দান কালে শিশুদেরকে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষকদের পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া ও সাজার সম্মুখীন করাকে একটি কার্যকর ও ফলপ্রদ রীতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শাস্তি প্রদান ও এর বিবিধ পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীদের মাঝে বিতর্ক বহু পুরাতন। পক্ষে ও বিপক্ষে দু'দিকেই মতামত বিদ্যমান। এক পক্ষ শাস্তি প্রদানের যাবতীয় পদ্ধতি প্রয়োগের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে তা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এতে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রশিক্ষাণার্থীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়। অপরপক্ষ শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে জরালো সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছেন, আদর্শ প্রজন্ম গঠন করতে হলে অবশ্যই এ কার্যকর রীতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। কারণ এটিই একমাত্র পদ্ধতি যা বিগড়ে যাওয়া শিশুকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে অতি সহজে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ ফলপ্রসূ এ রীতির সফল প্রতিফলন ঘটিয়ে কাঙ্খিত সফলতা লাভে সচেষ্ট হতে পারেন। এবং জাতিকে একটি সুসভ্য ও আদর্শ প্রজন্ম উপহার দিতে পারেন।

এদিকে সত্যনিষ্ঠ ধর্ম ইসলাম এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। শাস্তি প্রয়োগের রীতিকে একেবারে প্রত্যাখ্যানও করেনি। আবার অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর অবস্থা ও সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা না করে এবং কোনো নীতিমালার অনুবর্তণ ছাড়াই প্রয়োগের লাগামহীন স্বাধীনতাও দেয়নি। ইসলাম শাস্তি প্রদান রীতিকে আচরণ সংশোধনের একটি কার্যকর পন্থা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং অন্য কোনো পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হলে এ পন্থা অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছে। কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ওয়াজ নসিহত ও সুপরামর্শে কোনো কাজ হয় না। তখন কার্যকর অন্য কোনো পন্থা অনুসরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এ থেকেই শাস্তি প্রয়োগের এই কঠিন ও চূড়ান্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

সাজা: সংজ্ঞা ও লক্ষ্য

প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা সাজা তথা শাস্তি প্রদানের সজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, 'সাজা একটি প্রশিক্ষণ রীতি, যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে বিদ্যমান কু-অভ্যাস বিতাড়িত , প্রতিরোধ কিংবা মওকুফ করা'।

ইসলামি প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা উক্ত লক্ষ্যের সাথে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত করেছেন-

এক. মন্দ কাজের অশুভ পরিণতি হতে অপর লোকদের বাঁচানো, যার অনিষ্টি এক সময় তাদেরকেও স্পর্শ করতে পারে।

দুই. সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা- যাতে দন্ডিত ব্যক্তির সাজা প্রত্যক্ষকারী ও এ সম্বন্ধে জ্ঞাত সকলে সাবধান ও সংশোধন হয়ে যায় এবং কেউ এরূপ অপরাধের চিন্তা না করে। যেমন প্রকাশ্য শাস্তি প্রদান প্রসংগে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿2﴾ (النور:2)

আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে। (আন্ নূর:২)

সুতরাং ইসলামের ছায়াতলে বসবাসকারী শিশুদেরকে সাজা দানের মাধ্যমে কেবল তাদেরকে সংশোধন ও তার সাথে থাকা অপর লোকদেরকে সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য নয় বরং এর সাথে সাথে সর্ব স্তরের জনসাধারণের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ দানও এর অন্যতম লক্ষ্য।

প্রশিক্ষকদের শাস্তি প্রদান বিষয়ক তাৎপর্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকা অপরিহার্য্য:

ইসলাম সব সময়ই একটি মধ্যপন্থী ও উদার মতাদর্শের নাম। সর্ব ক্ষেত্রে ইসলাম পরস্পর বিরোধী দুই মতাদর্শের মাঝামাঝিতে অবস্থান নেয়। এক পক্ষের মতামতকে অন্ধ-বধিরের ন্যায় পরিপূর্ণরূপে গ্রহণও করে না। আবার না বুঝে না শুনে একেবারে উপেক্ষাও করে না। আমাদের আলোচ্য বষয়েও সেই নীতিই গ্রহণ করেছে ইসলাম। সর্ব যুগের জন্য উপযোগী করে একটি শাস্তিবিধি প্রনয়ণ করেছে। সেটি কখন প্রয়োগ করা হবে এবং কি ভাবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িক নীতি গ্রহণের গুরুত্ব দিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন থেকে সতর্ক করেছে ইসলাম কঠিনভাবে। বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে যে, শিক্ষাদান, চাল-চলন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে নম্রতা ও কোমলতা। আর শাস্তি প্রদান হল 'একটি সাময়িক ও আপতিত বিষয়' যা কেবল অন্য সকল পদ্ধতি অকার্যকর হয়ে গেলে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং প্রশিক্ষণের এই রীতি প্রয়োগ করতে হলে আগে প্রশিক্ষকদেরকে রীতিটি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হবে। অবস্থা, অবস্থান ও পরিস্থিতির অনুপূঙ্খ বিশ্লেষণের পরই কেবল প্রয়োগ করতে পারবে। সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও জরিপ চালানোর পর

একটি বিষয় উদঘাটিত হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে মন্দ পথ থেকে ফেরানোর জন্য কোনোরূপ নসিহত বা সতর্ক করা ব্যতীত কিংবা অন্য কোনো সহজ পন্থা অবলম্বন না করে শাস্তি প্রদান রীতি দিয়ে শুরু করলে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না। বরং প্রশিক্ষণ দান কালে যে কোনো ভুল পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করা হলে হিতে বিপরীত হয়।ফলাফল হয় উল্টা। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী কোনোভাবেই সেই সব মন্দ অভ্যাস ছাড়তে চায় না। বরং জেদের কারণে আরো বেশি করে করতে লাগে। তাই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকদেরকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হবে এবং তার কায়দা কানুন, রীতি-নীতি সম্বন্ধে গভীর ব্যুতপত্তি অর্জন করতে হবে। যাতে প্রশিক্ষণ হয় সঠিক, নির্ভুল ও শতভাগ কার্যকর।

ভুল প্রশিক্ষণ ও অন্যায্যভাবে শাস্তি প্রদান প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় এবং তাদের আত্মিক ক্ষতি সাধন করে। পিতা-মাতার পক্ষ হতে সন্তানদেরকে -হক কিংবা না হকভাবে- সার্বক্ষণিক তিরষ্কার, তাদের সাথে নির্দয় ও কঠোর আচরণ তাদের হীনমন্যতা ও মানসিক রোগের সবচে বড় কারণ। তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। এসব কারণে তাদের মন ও মননে বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ ভুল পদ্ধতির দুষ্ট ক্ষত নিয়ে তারা বেড়ে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে মানসিক, চারিত্রিক ও আদর্শিক দিক থেকে বেঁকে যেতে থাকে।

জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট বড় বড় প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা দাবি করে বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে আরব বিশ্বে সন্তান প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারমূলক পদ্ধতি। যা গঠিত হয়েছে, জবরদস্তি ও বাধ্য করণ, কর্তৃত্ব স্থাপন করণ, প্রভাব বিস্তার করণ ও ভীতি প্রদর্শন মূলনীতির উপর। এর একমাত্র কারণ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ প্রণালী বিষয়ক জ্ঞানের অভাব এবং পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ না করেই শাস্তি প্রদান রীতির যথেচ্ছ ব্যবহার।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ইসলামের প্রধান মূলনীতি হচ্ছে: নম্রতা, কোমলতা ও উৎসাহ প্রদান

ইসলাম সব সময় পুরষ্কৃত করণ ও উৎসাহ প্রদান নীতিকে ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তি প্রদান নীতির উপর অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ইসলাম বলে, মৌলিকত্বের বিচারে প্রশিক্ষকদের পক্ষ হতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি দয়া, মহানুভবতা, নম্রতার পন্থা অবলম্বনই হল প্রধান মূলনীতি। ইমাম বুখারি রহ. ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’

গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন,

عليك بالرفق واللين وإياك والعنف والفحش.

অর্থাৎ, তুমি নম্রতা ও কোমলতার রীতি গ্রহণ কর, আর কঠোরতা ও অশ্লীলতাকে পরিত্যাগ কর।

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর 'সহিহ'তে সাহাবি আবু মুসা আশআরি রা. থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن و قال لهما: يسرا ولاتعسرا، وعلّما ولاتنفرا.

অর্থাৎ, আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও মুয়াজ রা.কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তোমরা সহজ করবে কঠিন করবে না। শেখাবে (অর্থাৎ উৎসাহ দিবে) তাড়িয়ে দিবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. رواه البخاري.

'নিশ্চয় কোমলতা (র অনুবর্তন) বস্তুকে কেবল সুন্দরই করে।' (বর্ণনায় বোখারি)

ইসলাম প্রবর্তিত বে-নজির ও ফলপ্রসূ এই শিক্ষানীতির সার্থক বাস্তবায়ন দেখতে পাই আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে। ইমাম মুসলিম রহ. উদ্ধৃত করছেন,

أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه! ما شانكم تنظرون إليّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمّتونني سكتّ، فلمّا صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولاشتمني، بل قال صلى الله عليه وسلم : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সালামি রা. বলেন, 'একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করছিলাম, জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ হাঁচি দিল। আমি বললাম, 'য়ারহামুকাল্লাহ'। লোকেরা আমার দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করল। আমি বললাম, ওয়া ছুকলা উম্মাহ (আরে মহা জ্বালা), কি ব্যাপার আমার দিকে তাকিয়ে আছ? এ কথা শুনে তারা নিজ নিজ হাত দ্বারা স্বীয় উরুতে আঘাত করতে লাগল। আমি বুঝলাম, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তাই নীরব হয়ে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করলেন -তাঁর উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে উত্তম প্রশিক্ষক আর কাউকে পাইনি। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে ধমক দেননি, আঘাত করেননি এবং গালমন্দও করেননি।- বরং বলেছেন, নিশ্চয় এই সালাতে মানুষের কোনো কথা সঙ্গত নয় বরং এটি হচ্ছে, তাসবিহ, তাকবির ও কোরআন তেলাওয়াত'।

এই হলো, ইতিহাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাবিদ, শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহীত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। ভুল সংশোধনের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

কঠোরতার রীতি এড়িয়ে উৎসাহ প্রদান রীতিই অগ্রাধিকারযোগ্য। আর সাহস যুগিয়ে কাজ নেয়ার নীতিই আদর্শ নীতি এবং ফল প্রদানে সর্বাধিক কার্যকর। বিশ্ববিখ্যাত চিন্তক আল্লামা ইবনে খালদুনও এই মতবাদ পোষণ করতেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা 'মোকাদ্দামা'-তে উল্লেখ করেছেন, 'ছাত্র কিংবা ভৃত্য পর্যায়ের প্রশিক্ষনার্থীর সাথে যদি প্রশিক্ষক কঠোরতার নীতি অবলম্বন করে প্রশিক্ষণ দেয় তাহলে এটি তার মেধা ও মননে বিরূপ প্রভাব ফেলে, অন্তর সংকোচিত হয়ে যায়, প্রতিভা বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, উদ্যম বিদায় নেয় এবং সে অলস ও অকর্মন্য হয়ে পড়ে। ক্রমাগত ধমক ও হুমকির কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যা, প্রতারণা ও চালাকির পথ অনুসরণ করে।

তবে ইবনে খালদুনও অন্যান্য ইসলামি চিন্তাবিদদের মত বলেছেন, নম্রতা ও কোমলতার পদ্ধতিতে কাজ না হলে কিংবা কাঙ্খিত ফল পাওয়া না গেলে কঠোর নীতি গ্রহণ করাতে দোষ নেই। বরং তখন তাই করতে হবে।

সুতরাং শিশুর মাঝে ভাল কিছু পরিদৃষ্ট হলে প্রশংসা করতে হবে। আর মন্দ আচরণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না। বরং প্রথম প্রথম উপেক্ষা করবে, এমন ভাব করবে যেন তিনি দেখেননি। যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে উপদেশ দিবে। সতর্ক করবে। মন্দ আচরণের কুপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। নানা ভাবে বুঝানোর চেষ্টা করবে। তাতেও কাজ না হলে অপরাধের

মাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে হালকা শাস্তি দিবে। জেদের বশবতি হয়ে কিংবা রাগ-রোষের কারণে যেন বাড়াবাড়ি হয়ে না যায় সে দিকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

শাস্তি কার্যকর করার আগে অপরাধীর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা

মানুষ মাত্রই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের অধিকারী। প্রকৃতিগত দিক যেমন বোধ-বুদ্ধি, নমনীয়তা, নসিহত গ্রহণ করার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মাঝে ভিন্নতা বিদ্যমান। তেমনি মেজাজ-মর্জির দিক থেকেও তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কেউ একেবারে শান্ত-শিষ্ট-ভদ্র মেজাজের। কেউ কেউ মাঝারি মানের আবার অনেক আছে চরম জেদী ও বদ মেজাজি। এ প্রকৃতি ভিন্নতার বিবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে বংশানুক্রম ও পরিবেশগত অবস্থা। এখন নানা প্রকৃতির অপরাধীকে যদি একই শাস্তির আওতায় আনা হয় তাহলে ভাল ফলাফলের আশাতো করা যাবেই না বরং অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত হবে। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশর কথা বিবেচনা করে সংশোধন পদ্ধতিতে ভিন্নতা আনতে হবে এবং প্রত্যেকের মেজাজ ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে তার সাথে প্রযোজ্য ও কার্যকর সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। অনেক শিশু আছে অপরাধ থেকে ফেরানোর জন্য সামান্য সংকেত বা ইশারাই যথেষ্ট। যেমন প্রবাদ আছে, বুদ্ধিমান ইশারাতেই বুঝে নেয়। কিছু শিশু আছে চোখ রাঙিয়ে ধমক না দিলে কাজ হয় না। আবার অনেক আছে, তিরষ্কার ও বকাঝকা করতে হয়। এসবে কাজ না হলে কারো কারো ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হয়। প্রশিক্ষক একান্ত নিরুপায় হয়ে সর্বশেষ প্রতিশেধক হিসাবে এই পদ্ধতির দ্বারস্থ হন। এই তারতম্য প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কারণেই হয়ে থাকে।

কবি চমৎকার বলেছেন,

العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة

কৃতদাসকে নাড়া দিতে লাঠির প্রয়োজন হয়, আর স্বাধীনের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

সুতরাং সকল অপরাধীর জন্য একই শাস্তি প্রযোজ্য নয়। বরং মেজাজ মর্জির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। আর তাই প্রশিক্ষককে এসব ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

শাস্তি প্রদানে ক্রমান্বয়িক নীতি ও তার গুরুত্ব

অসভ্য আচরণ নিয়ন্ত্রণে অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। শাস্তিপ্রদান পদ্ধতি হচ্ছে সর্ব শেষ পদ্ধতি। আর এর চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে শারীরিক আঘাত বা প্রহার। তাই প্রশিক্ষককে চূড়ান্ত স্তরে যাওয়ার আগে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রাথমিক স্তরগুলো পাড়ি দিতে হবে। এবং অন্য পদ্ধতিগুলো আগে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই বোধ করি সন্তানের মাঝে বিদ্যমান বক্রতা ও আচরণগত মন্দ দিকগুলোর সংশোধন হবে। এবং এর মাধ্যমে তার চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। ইমাম গাযালির ভাষায়. প্রশিক্ষক হচ্ছেন চিকিৎসকের মত। তাই প্রথমে তাঁকে লুকিয়ে থাকা রোগ সম্পর্কে জানতে হবে। আক্রান্ত স্থান সম্বন্ধে ধারণা নিতে হবে। রোগের ধরণ প্রকৃতি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। যাতে যথোপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগ করে রুগীকে সুস্থ করা যায়। সহজ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব হলে কঠিন পদ্ধতির দিকে ধাবিত হওয়া উচিত হবে না। হ্যাঁ কোনো পদ্ধতিতে কাজ না হলে চূড়ান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করাতে দোষ নেই। যেমন বলা হয়, সেঁক দেওয়া হলো সর্বশেষ চিকিৎসা...।

খানিক আগে আমরা আলোচনা করেছি, কার্যকরিতার দিক দিয়ে একই পদ্ধতি সকল অপরাধীর ক্ষেত্রে এক সমান নয়। বরং অপরাধ, অপরাধীর মেজাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির বিভিন্নতায় সংশোধন ও শাস্তি প্রদান পদ্ধতিও বিভিন্ন হয়ে যায়। এ কারণেই এই বিষয়ে একটি কার্যকর নীতিমালা থাকা খুবই প্রয়োজন। যা বহু ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ির মত হবে। আর প্রশিক্ষকদের দায়িত্ব হবে পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে যতদূর সম্ভব নিম্নধাপ থেকে শুরা করা। সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে সর্ব প্রকার অপরাধ নির্মূলে কিন্তু একই শাস্তি কার্যকর নয়। বা সব অপরাধ একই ধরণের শাস্তি তলব করে না। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে অপরাধের ধরণ ও মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই শাস্তি প্রদান জরুরি। যেমন বলা হয়ে থাকে, শারীরিক শাস্তি বা বেত্রাঘাত হচ্ছে উক্ত সিঁড়ির সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধাপ তাই একান্ত নিরুপায় না হলে ঐ দিকে যাওয়া ঠিক হবে না।

শাস্তি প্রদানে ক্রমান্বয়িক নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন মূলত: দুইটি কারণে

এক. প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করতে হলে একাধিক বিকল্প পদ্ধতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ শিশুরা প্রকৃতিগতভাবে বার বার ভুল করে। শাস্তিও -সাধারণত- দিতে হয় একাধিক বার। তাই পদ্ধতিগত দিক থেকে শাস্তির পরিধি অনেক দীর্ঘ হওয়া জরুরি। যাতে মাধ্যমগুলো খুব দ্রুত ফুরিয়ে না যায় এবং কাছাকাছি সময়ের

মধ্যে একই পদ্ধতি বার বার প্রয়োগ করতে না হয়। কারণ তাতে শাস্তির ক্রিয়া নি:শেষ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে অকেজোই হয়ে যায়।

দুই. শাস্তি হিসাবে অন্যসব মাধ্যম বাদ দিয়ে কেবল বেত্রঘাতের বেশি বেশি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীকে এর উপর অভ্যস্ত করে তোলার পেছনে বিপদ অনেক। এতে প্রশিক্ষনার্থীর অনেক ক্ষতি হয়। কারণ বেত্রাঘাত শারীরিক শাস্তি, আর শরীর হচ্ছে একটি কষ্ট সহিষ্ণ বস্তু, ধীরে ধীরে কষ্টের উপর অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া তার সৃষ্টিগত প্রকৃতি। তাই এ পদ্ধতির অধিক প্রয়োগের কারণে এক সময় এটি আর কোনো কাজ করবে না। তখন ব্যাপারটি হবে এমন যে, আমরা একই সাথে সবগুলো কার্যকর পদ্ধতি শেষ করে ফেলেছি। কারণ যে শিশু তুলনামূলক কঠিন শাস্তি-বেত্রাঘাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তার ক্ষেত্রে অন্য কোনো পদ্ধতি যেমন চোখ রাঙ্গানি, রাগারাগি, হুমকি-ধমকি ইত্যাদি আর কার্যকর হবে না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করার গুরুত্ব অপরিসীম। এবং তার মাধ্যমে কাজ নেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। কারণ শাস্তির মাত্রা যদি সীমা অতিক্রম করে যায় তাহলে প্রশিক্ষনার্থীর মাঝে আর তার কোনো প্রভাব থাকে না।

শাস্তি প্রদান ও দন্ড বিষয়ক ক্রমধাপ

বিগড়ে যাওয়া শিশুদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে শিষ্টাচার শেখাতে এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান বক্রতা দূর করতে ইসলাম প্রশিক্ষকদের সম্মুখে কার্যকর ও সুস্পষ্ট অনেকগুলো পদ্ধতি তুলে ধরেছে। ইসলামি প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা সে লক্ষ্যে সাতধাপ বিশিষ্ট নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম বিন্যাস করেছেন।

প্রথম ধাপ: ভুল বা অপরাধ না দেখার ভান করা এবং এড়িয়ে যাওয়া

কারণ হতে পারে পরিদৃষ্ট ভুলটি অনিচ্ছায় এবং আকস্মিক হয়ে গিয়েছে, ভবিষ্যতে আর নাও হতে পারে। তবে যদি একই ভুল বার বার সংঘটিত হতে দেখা যায় তাহলে আমরা দ্বিতীয় ধাপের দিকে পদার্পণ করতে পারব।

দ্বিতীয় ধাপ: নসিহত ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে ভুল শুধরে দেওয়া

ভুল সংশোধনে ফলপ্রসূ আলোচনাকে -যার মাধ্যমে কাজের মন্দদিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে- প্রথম কার্যকর ধাপ বলে পরিগণিত করা হয়। হাদিস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক শিশুকে কত সুন্দর ও নান্দনিকতার সাথে, খুবই সংক্ষিপ্ত তবে প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় ভুল

ধরিয়ে দিয়েছেন এবং এরূপ ভুল যাতে আবারো না হয় তার প্রতি দিক-নির্দেশনা দান করেছেন।

ইমাম বোখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. সাহাবি ওমর বিন আবু সালামা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীন একজন গোলাম ছিলাম। (খাওয়ার সময়) আমার হাত প্লেটে (সব স্থানে) ছুটোছুটি করত। তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন! হে বালক, বিসমিল্লাহ বল। ডান হাত দিয়ে খাও। এবং তোমার দিক থেকে খাও।

তৃতীয় ধাপ: কোমল ও সদয় আচরণের মাধ্যমে ভুল ধরিয়ে দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জনৈক বালককে পানীয় পান ক্ষেত্রে নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে অগ্রাধিকার দান বিষয়ে শিষ্টাচার শেখাতে চাইলেন। তখন তিনি তার সাথে সে বিষয়ে কোমল আচরণ করলেন এবং তাদের বয়সের প্রতি ইংগিত করে তার অনুমতি চাইলেন।

ইমাম বোখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. নিজ নিজ গ্রন্থে সাহাবি সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খানিক পানীয় নিয়ে আসা হল। তিনি তাহতে পান করলেন। (সে সময়) তাঁর ডান পাশে ছিলেন একজন বালক আর বাম পাশে বয়স্ক কিছু সাহাবি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালককে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আমাকে (পানীয় পাত্র) ওঁদের হাতে দেওয়ার অনুমতি দেবে? বালক বললেন, না, আল্লাহর শপথ, আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দেব না। সেখানে বালকটি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানীয়ের অবশিষ্টাংশের ক্ষেত্রে নিজেকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

চতুর্থ ধাপ: ইশারার মাধ্যমে ভুল ধরিয়ে দেওয়া

ইমাম বোখারি রহ. সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ফজল বিন আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহনে তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। এরই মাঝে খাসআম গোত্রের জনৈকা নারী সেখানে আসলে ফজল তার দিকে আর সে ফজলের দিকে তাকাতাকি করতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন।

এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেগানা নারী দর্শনের অপরাধটি কোনো কথা না বলে অপরাধীর চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সংশোধন করেছেন। আর এটি ফজলের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। তিনি সাথে সাথে সে অপরাধ থেকে ফিরে এসেছেন।

পঞ্চম ধাপ: ভৎসনা ও নিন্দার মাধ্যমে ভুল শুধরে দেওয়া

প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা ভৎসনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। নির্বাক ভৎসনা -যা প্রথম পর্যায়ে প্রয়োগ হবে- সবাক ভৎসনা যা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োগ হবে। নির্বাক ভৎসনার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণার্থীর সাথে মলিন মুখে কথা বলা। চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে তোলা। শিশুর সাথে হাসিমাখা মুখে কথা বললে যদি তার হৃদয়ে প্রশান্তি ও আনন্দের উদ্রেক হয়। আর এটি তার প্রতি সন্তুষ্টির পরিচয় বহন করে। তাহলে ঐ হাসির অনুপস্থিতি এবং তার পরিবর্তে মলিনতা অবশ্যই তার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কাজ দেবে এবং সেই ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে। সাইয়্যেদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু দেখে অপছন্দ করলে আমরা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারতাম।

সবাক ভৎসনার স্তরটি নির্বাক ভৎসনার তুলনায় একটু কঠিন ও শক্ত। বরং এটি এক প্রকারের শাস্তি। তাই এটি কারো কারো ক্ষেত্রে কার্যকর হলে অন্যদের ক্ষেত্রে কার্যকর নাও হতে পারে। তাছাড়া এর জন্য বিশেষ কিছু নীতিমালা ও কায়দা-কানুন রয়েছে। সবচে গুরুত্বপূর্ণ হল, নিন্দা খুব শক্ত ও কঠোর ভাষায় করা যাবে না, গালমন্দ করা যাবে না, অপমান কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা যাবে না ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষণদান ক্ষেত্রে শাস্তির এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বোখারির বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাথে গালাগালিতে জড়িয়ে পড়ি, আমি তার মায়ের নাম তুলে গালি দিয়ে তাকে অপমান করি-লজ্জা দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু জর, তুমি তাকে তার মায়ের নাম তুলে গালি দিলে? তোমার মাঝে জাহেলি সংস্কৃতি বিদ্যমান।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ, আমরা দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় সাহাবি আবু জরকে তিরস্কার করেছেন। এবং ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নবীজী

পরিমিত বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এমন ভাষাই ব্যবহার করেছেন যা স্থানের সাথে ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

ষষ্ঠ ধাপ: কথাবার্তা বর্জন করার মাধ্যমে ভুল শুধরে দেওয়া

সংশোধনের এ রীতিটি কেবলমাত্র একটি অবস্থাতে কার্যকর হবে, আর তা হলো প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে পূর্ব হতে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের বিদ্যমানতা। স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে উপদেশ ও নসিহতে কাজ না হলে পরবর্তী শাস্তি হচ্ছে তাকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করা এবং কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

অর্থাৎ, আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর। {সূরা নিসা:৩৪}

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলেরই জানা । বিষয়টিকে কা'ব বিন মালেক রা. এর ঘটনাও সমর্থন করে অত্যন্ত জোরালোভাবে। ইমাম বোখারি রহ. বর্ণনা করেন,

সাহাবি কা'ব বিন মালেক রা. যখন তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ না করে অনুপস্থিত থেকে গিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করেছিলেন, পঞ্চাশ রাত্রি পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। এক পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে তাদের তাওবা কবুলের বিষয়টি অবতীর্ণ হয়। আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবিদের ভুল সংশোধন ও শুধরে দেওয়ার নিমিত্তে তাদেরকে সাময়িক ত্যাগ করেছিলেন। কথাবার্তা বন্ধ রেখেছিলেন। নবীজীর এ কর্মটি তাদের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেছিল কারণ তাদের অন্তরে তাঁর অবস্থান ছিল সবার উপরে। তাঁর প্রতি ভালবাসা ছিল সবচে বেশি।

সপ্তম ধাপ: প্রহার বা শারীরিক আঘাতের মাধ্যমে ভুল শুধরানো

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয়, বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে সন্তান প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণদান কালে শাস্তিপ্রদান প্রয়োজন হলে একলাফে সপ্তম স্তরে চলে যাওয়া হয়। দায়িত্বশীল প্রশিক্ষকরা তার আগের স্তরগুলোর প্রতি নজর দিতে চান না। তাদের এ অবস্থাকে মূল্যায়ন করতে হলে

বলতেই হয় যে, তাঁরা তাদের সন্তানদের স্বাধীন লোকদের প্রশিক্ষণ নয়, কৃতদাস জাতীয় প্রশিক্ষণে বিশ্বাসী ।

শারীরিক আঘাত বা প্রহার হচ্ছে শাস্তির সর্বশেষ স্তর যা ইসলামও স্বীকার করেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ইসলামের এ অনুমোদন সহধর্মিনী ও বয়স্কলোকদের জন্যও প্রযোজ্য। তবে তার জন্য রয়েছে অনেকগুলো শর্ত । তাহলে উদিয়মান কচি শিশুদের ক্ষেত্রে একেবারে অবাধ হয় কি করে? এতদসত্বেও প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রহারের প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে খুব বিতর্ক হয়েছে, এখনো চলছে। এরই সূত্র ধরে আরব বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শাস্তি প্রদান মাধ্যম হিসাবে প্রহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি এতদূর গড়িয়েছে যে, কতিপয় প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী প্রহারকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। তারা যুক্তি হিসাবে দাঁড় করেছেন, প্রহার একটি আদিম ও নিষ্ফল পদ্ধতি। এর মাধ্যমে শাস্তিপ্রাপ্ত শিশু মনো ও স্নায়বিকরোগে আক্রান্ত হয়। দু:খের সাথে বলতে হয়, এসব বিজ্ঞানীরা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে নিজেদের অতীত ভুলে গেলেন অথবা ভুলে যাবার ভান করলেন। তাঁদের শিশু বয়সে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে এ পদ্ধতিরই প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করা হয়েছে। তাঁদেরকে শিষ্ট ও ভদ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সমাজে তাঁদের একটি মর্যাদাকর অবস্থান তৈরি হয়েছে। কই তাঁরাতো মনোরোগ কিংবা স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হননি?

সর্বশেষ বৃটেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষকদের জন্য শ্রেণীকক্ষে প্রহারের অনুমতি দিয়েছে। বিশেষ করে যেসব ছাত্র গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি করে কিংবা প্রহার ছাড়া যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার আর কোনো উপায় না থাকে। ‘প্রহার একটি কার্যকর ও ফলদায়ক শাস্তি ব্যবস্থা’ বৃটেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হল। বিজ্ঞানীরা যে যুক্তির আলোকে প্রহার নিষিদ্ধ করেছেন সেটি আসলে কোনো মৌলিক যুক্তি নয়। কারণ, হতে পারে শাস্তি দাতার বাড়াবাড়ি পর্যায়ের প্রহারের কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া প্রহার ব্যতীত অন্যান্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাও এ জন্য দায়ী।

শস্তি পদ্ধতি হিসাবে ‘প্রহার’ কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারাও অনুমোদিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (النساء:34)

আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। (সূরা নিসা: ৩৪)

সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين. (مسند أحمد)

তোমারা নিজ সন্তাদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও, আর তার জন্য দশ বছর বয়সে প্রহার কর। (মুসনাদু ইমাম আহমাদ)

শাস্তি হিসাবে প্রহারের ভয়াবহতার কারণে তাকে অনেকগুলো শর্ত ও সতর্কতা দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো আমি খানিক পর আলোচনা করব। প্রহারের পর্বটি ধারাবাহিক কিছু স্তর পাড়ি দেবার পর আসবে।

প্রথমে ঘরে লাঠি কিংবা বেত জাতীয় কিছু ঝুলিয়ে প্রহারের ভয় দেখানো হবে। যেমন ইমাম বোখারি রহ. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق السوط في البيت.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে লাঠি ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরূপ ভীতি প্রদর্শনে কাজ না হলে অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থী দুষ্টামি থেকে বিরত না হলে হালকা প্রহার করা হবে, যেমন কান ধরে টান মারা ইত্যাদি। ইমাম নববী 'আল-আজকার' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

أن عبد الله بن يسر المازني رضي الله عنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت أخذ بأذني وقال: يا غدر!.

আব্দুল্লাহ বিন ইউসর আল-মাজনি রা. বলেন, আমার মা আমাকে আঙ্গুরের একটি থোঁকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। আমি সেটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়ার আগেই তা হতে কিছু খেয়ে ফেলেছি। এরপর তাঁর নিকট আসলে তিনি আমার কান ধরে বললেন, আরে দুষ্ট!

এতেও কাজ না হলে শারীরিক শাস্তি অর্থাৎ প্রহার করা যাবে। তবে খুব শক্ত মার দিয়ে রক্তাক্ত বা আহত করে ফেলা যাবে না। মাথা, বুক, পেট ও লজ্জাস্থান জাতীয় স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করা যাবে না। গবেষকরা গবেষণা করে বের করেছেন যে শরীরে প্রহারের জন্য সবচে উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে, দু'হাত ও দু'পা।

প্রহারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে জনসম্মুখে প্রহার করা। যদি পরিস্থিতি দাবি করে তাহলে তাই করতে হবে। শাস্তির প্রতিটি পদ্ধতির চূড়ান্তরূপ হচ্ছে তা-ই। শাস্তির এ পদ্ধতি অপরাধীর জন্য অপরাধ হতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর আর প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য সতর্ককারী।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿2﴾ (سورة النور : 2)

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে। {সূরা নূর:২}

এখানে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বেত্রাঘাতের কথা বলে শেষাংশে বলেছেন তাদের শাস্তি যেন মুমিনদের একটি দল প্রত্যক্ষ করে। এর উদ্দেশ্য বোধ করি অপরাধীকে অপরাধ হতে কার্যকরভাবে ফিরিয়ে আনা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সকর্ত করা।

প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন যে, ছোট বাচ্চাকে তার সাথীদের সম্মুখে শাস্তি প্রদান করা হলে ফল প্রদানের দিক থেকে বেশি কার্যকর হয়। কারণ এর মাধ্যেমে তার অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয় যে এরূপ চলতে থাকলে তাদের কাছে তার মর্যাদাগত অবস্থান আর ধরে রাখা যাবে না, নীচে পড়ে যাবে। আর এ কারণেই প্রকাশ্য শাস্তি দানের প্রতি কেবল ইশারা করা হলেই অপরাধ থেকে ফিরে চলে আসে। শাস্তি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় না।

কার্যকর শাস্তি প্রদানের শর্তসমূহ:

শাস্তিপ্রদান কে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার বা সংশোধন পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু শর্তের অনুবর্তিতার প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত নিচে উল্লেখ করা হল:

১. তুলনামূলক সহজতর সংশোধন পদ্ধতির বিদ্যমানতায় শাস্তি প্রয়োগের দিকে অগ্রসর না হওয়া। যেমন আলোচনা, উপদেশ, সঠিক পথের প্রতি দিকনির্দেশনা দান ইত্যাদি প্রয়োগ করা ব্যতীত প্রথমেই শাস্তি প্রদান পদ্ধতির দ্বারস্থ না হওয়া। এ গুলোতে কাজ না হলে পরবর্তী পর্যায়ে এ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

২. শাস্তি বাস্তবায়ন কালে অতিরঞ্জন না করা। এতে করে শিক্ষার্থী বিগড়ে যাবে। কোনো শাস্তিই সে আর গ্রহণ করবে না।

৩. বাচনিক শাস্তি প্রয়োগের সময় অশালীন, অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার না করা। গালমন্দ না করা।

৪. বাস্তবায়ন যোগ্য নয় এমন কথা বলে হুমকি না দেওয়া। যেমন, ফের এসব করলে একেবারে হত্যাই করে ফেলব। জবাই করে দেব ইত্যাদি।

৫. শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাচ্চাকে বাধ্য করণার্থে শাস্তি প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ না করা।

৬. শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধ সঙ্ঘটিত হবার সাথে সাথে তড়িৎ ব্যবস্থা নেওয়া। অপরাধ ও শাস্তি প্রদানের মাঝে দীর্ঘ সময় বিলম্ব না করা।

৭. শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িক পন্থা অবলম্বন করা। এবং শিক্ষার্থীর বয়স, মেজাজ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮. শাস্তি যেন প্রশিক্ষকের ক্রোধান্বিত অবস্থায় প্রয়োগ না হয়। কারণ শাস্তিদাতা শাস্তি প্রদানের সময় রাগান্বিত থাকলে সেটি আর সংশোধনের পর্যায়ে থাকবে না। প্রতিশোধ গ্রহণের পর্যায়ে চলে যাবে। এবং এর দ্বারা সংশোধন করা হবে না, হবে জিঘাংসা চরিতার্থ করা।

৯. শাস্তি প্রদান যেন পানাহার থেকে বারণ পর্যায় পর্যন্ত না গড়ায়। কারণ এর মাঝে বাচ্চার স্বাস্থ্যগত ক্ষতি নিহিত আছে। এর দ্বারা বাচ্চার সংশোধন হবে না। বরং উপকারের জায়গায় ক্ষতি হয়ে যাবে।

এখানে আরও কিছু শর্ত আছে যা শুধুমাত্র প্রহার বা শারীরিক শাস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। সংক্ষিপ্তাকারে কিছু পেশ করা হল:

১. প্রহার শুরুর বয়স : বাচ্চাকে কত বছর বয়স থেকে প্রহার করা যাবে এ নিয়ে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, দশ বছর বয়স থেকে অর্থাৎ বাচ্চার বয়স দশ বছর হলে প্রহার করা যাবে এর আগে নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য দশ বছরের পর বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আরও উত্তম মত হলো, বাচ্চার ভালো-মন্দ পার্থক্য করার মত বয়স হয়ে গেলে এবং ভুল ও অপরাধ বুঝার মত বুদ্ধি হয়ে গেলেই প্রহার করা যাবে। অর্থাৎ যখন থেকে সে বুঝতে শিখবে যে আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি কিংবা এ অপরাধের জন্য আমাকে শাস্তি পাওয়া উচিৎ তখন থেকেই তাকে প্রহার করা যাবে।

২. **আঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ।** প্রহার করার আগে প্রশিক্ষককে অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ কোনো কোনো অপরাধীর ক্ষেত্রে কেবল একটি বেত্রাঘাত অপরাধ থেকে ফেরাতে যথেষ্ট। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে আরও বেশির প্রয়োজন হতে পারে। তবে উত্তম হচ্ছে, আঘাতের সংখ্যা দশ-এর বেশি না হওয়া। এ দিকটির প্রতি কঠিন ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ ইমাম বোখারি রহ. নিজ 'সহিহ'তে সাহাবি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجلد فوق حد من حدود الله فوق عشر جلدات.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্ধারিত হদের বেশি-দশ বেত্রাঘাতের বেশি কাউকে বেত্রঘাত করতেন না।

তবে বাচ্চা যদি বয়োপ্রাপ্তির সন্ধিক্ষণে উপনীত হয় আর সম্পাদিত আরাধের চাহিদা আরো বেশি হয় তাহলে পরিস্থিতির বিচারে দশ-এর অধিকও আঘাত করা যাবে।

৩. শরীরের একই স্থানে প্রহার না করে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা। এবং খুব হালকাভাবে প্রহার করা। মনে রাখতে হবে, প্রহার করা হচ্ছে শিষ্টতা শেখানোর জন্য, প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়।

৪. মাথা, বক্ষদেশ, পেট ও লজ্জাস্থানের মত স্পর্শকাতর জায়গায় প্রহার করা যাবে না।

৫. প্রহারের সময় প্রহারকারী প্রশিক্ষককে শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে হবে। রাগান্বিত অবস্থায় প্রহার করা যাবে না। এতে জুলুম হয়ে যেতে পারে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত শিশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট পেতে পারে।

৬. অপর কোনো শিশু বিশষত: তার সাথীকে প্রহারের কতৃত্ব দিবে না।

৭. পেটানোর জন্য লাঠি বাছাই করা। উত্তম হলো সোজা ও মাঝারি আকারের কাঁচা বেত।

শাস্তি প্রয়োগের পর প্রশিক্ষনার্থীর সাথে প্রশিক্ষকের সম্পর্ক ও ব্যবহার কেমন হবে?

শাস্তি প্রদানের পর প্রশিক্ষক শাস্তিপ্রাপ্ত প্রশিক্ষনার্থীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন। যদি দেখা যায় যে শাস্তিতে কাজ হয়েছে, অপরাধ থেকে ফিরে এসেছে। অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বভাব ও চালচলনে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। তাহলে প্রশিক্ষক তার সাথে স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। উদারতা ও স্নেহ সুলভ ব্যবহার করবেন। হাসিমুখে কথা বলবেন। আচরণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা

করবেন যে, আমি কেবল তোমার ভালর জন্যই শাস্তি দিয়েছি। তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যই কঠোরতা অবলম্বন করেছি। আমার নিজের কোনো স্বার্থ ছিল না এতে। তোমার মঙ্গলই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এটিই ছিল দয়াময় ও স্বার্থক প্রশিক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশিক্ষণ রীতি। এ নীতির অনুবর্তিতায় তিনি নিজ সাহাবিদের প্রশিক্ষণ দান করতেন। শাস্তি প্রদানের পর তিনি তাদের সাথে এরূপ কোমল ব্যবহারই করতেন। দেখুন, তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হওয়া সাহাবি কা'ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে তাঁর মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যবহারের নমুনা। ইমাম বোখারি রহ. নিজ 'সহিহ'তে উদ্ধৃত করেছেন, কা'ব রা. বলেন,

فلما سلّمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مرّ عليك مذ ولدتك أمّك.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, -তখন তাঁর চেহারা খুশিতে চমকাচ্ছিল- তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়া সবচে উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

এটি ছিল তাঁর তাওবা কবুল হবার পরের ঘটনা। বাচ্চা শাস্তি প্রয়োগের পর যখন দেখতে পাবে যে শিক্ষক শাস্তিদানের পরও তার সাথে ভাল ব্যবহার করছেন। তাকে আদর-স্নেহ করছেন। তখন সে বুঝে নিবে যে শিক্ষক তার সংশোধন ও ভালর জন্যই শাস্তি দিয়েছেন। তিনি তার কল্যাণই কামনা করেছেন। এতে তার উপর খুব প্রভাব পড়বে। মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগে উদ্যোগী হবে। ভুল রাস্তা ছেড়ে ভাল পথে ফিরে আসার উৎসাহ অনুভব করবে। এবং শিক্ষকের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা মন্দ ধারণা জন্মাবে না। মনে এরূপ কিছুই থাকবে না।

ভুল ও কঠিন শাস্তির পরিণতি :

একটি বিষয় সকলেরই জানা থাকা দরকার যে, স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করে শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা কিংবা শাস্তির সাথে অপরাধের সামঞ্জস্য বিধান না করা শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর অন্তরে শাস্তিদাতা প্রশিক্ষকের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। আর অপমান ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদানে কঠোরতা করা, কঠিন শাস্তি আরোপ করা, কঠোর আচরণ করা কিংবা শক্তভাবে হুমকি-ধমকি প্রদান করার দ্বারা কেবল হীনবল, কাপুরুষ ও ছোট মানসিকতা সম্পন্ন প্রজন্মই তৈরি হয়। এসব কারণে তাদের সৃজনশীল মানসিকতা নষ্ট হয়ে

যায়। চিন্তা, দর্শন, পরিকল্পনা, সংকল্প ইত্যাদিতে কোনো নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। বরং প্রতিযোগিতায় সবক্ষেত্রে কেবল পিছিয়ে যায়। তাই এসব ক্ষেত্রে সাবধানতা ও বিচক্ষণতার কোনো বিকল্প নেই।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিস্কার হয়েছে যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ শাস্তিপ্রদান প্রশিক্ষনার্থীর আচরণিক বৈরিতা পরিবর্তন ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনে একটি কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সফল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। বিশেষত: যখন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী ও বিজ্ঞান সম্মত নীতি-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। আরও লক্ষ্য রাখা হয় শাস্তির সম্মুখীন অপরাধী ও অপরাধের প্রকৃতির প্রতি। যেমনিভাবে পরিস্কার হয়েছে শাস্তি প্রদান পদ্ধতির অনুবর্তিতায় শিষ্টতা প্রশিক্ষণ, বদ অভ্যাস ও মন্দ আচরণের মাঝে বেড়ে উঠার ধারা প্রতিরোধ করে। পাশাপাশি প্রশিক্ষনার্থীর মাঝে একটি অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ সঞ্চারিত করে যার মাধ্যমে সে সেসব বৈরি আচরণ ও মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করার প্রেরণা লাভ করে। আর শাস্তি বিহীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে অপরাধের প্রবণতা নিয়েই বেড়ে উঠে এবং তার মাঝে এক ধরনের পশুত্ব বিরাজিত থাকে। সব সময় নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ কর্মের মাঝে ঘোরাঘুরি করে। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মদ কুতুব রহ.-এর দর্শনও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করছে জরালোভাবে। তিনি বলেন, “শাস্তি প্রদান রীতির অনুবর্তন ব্যতীত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রজন্ম মূলত: অকর্মন্য ও নির্বোধ প্রজন্ম, জীবনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ক্ষেত্রে যারা কোনোই ভূমিকা রাখতে পারে না। দর্শন যতই আকর্ষনীয় ও শ্রুতিমধুর হোক না কেন অনুবর্তনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই অগ্রাধিকার যোগ্য। বাচ্চাদের প্রতি প্রকৃত মায়া-মমতা হচ্ছে সেটিই যা তাদেরকে সোনালী ভবিষ্যৎ গড়তে সহযোগিতা করে। যে মায়া-মমতা তার মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে দেয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে কোনোভাবেই মমতা বলা যায় না।”

সমাপ্ত